HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৭ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০০৯
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৮

বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩ ভাইরাসের সংক্রমণে শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত গুচ্ছ এলাকা (ক্লাস্টার)

পৃষ্ঠা ১৪

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে নিম্নবিত্তদের মধ্যে হেপাটাইটিস-ই রোগের প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ২০

সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) ১৮ জুন থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত ৬০৪ জন রোগী সনাক্ত করে। এই মহামারীতে আক্রান্ত রোগীরা তাদের অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে গড়ে সাতদিন চিকিৎসাসেবা নেয়। শতকরা ছিয়াশিজন রোগী হালকা অসুস্থতাসহ চলাফেরায় সক্ষম ছিলো, তবে ১৫ জনের (২%) এমন অসুস্থতা ছিলো যা শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণ জনিত রোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্বে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ ছিলো না এমন দুজন রোগী তাদের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার দুসপ্তাহেরও বেশি পরে অসেল্টামিভির গ্রহণ করে এবং তারা মারা যায়। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত এমন একজন তৃতীয় পরীক্ষিত রোগীও মারা যায়, যার হৃদরোগ ছিলো কিন্তু তা সুনির্দিষ্ট ছিলো না (মৃত্যুহার ০.৫%)। বাংলাদেশে যাদের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ অথবা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি আছে, রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের হাসপাতালে গিয়ে এইচ১এন১ সন্দেহে অসেল্টামিভির গ্রহণ করা উচিত।

২০০৯ সালের মার্চে মেক্সিকোতে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা-সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়। ২৩ এপ্রিল কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় মেক্সিকো থেকে পাঠানো নমুনায় এইচ১এন১ মহামারীর ভাইরাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় (১)। বিমানে ভ্রমণকারীরা নিজেদের অজান্তে ভাইরাসটিতে সংক্রামিত হয় এবং তাদের মাধ্যমে এটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হয় এবং ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১১ জুন ২০০৯ এটিকে একটি মহামারী হিসেবে ঘোষণা

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

করে (২)। সেই থেকে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়ে ৩১৮,৯২৫ জনেরও বেশি রোগী সনাক্ত করা হয় যাদের মধ্যে ৩,৯১৭ জন মারা যায়। মৃত্যুহার শতকরা এক দশমিক দু ভাগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক চিহ্নিত পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পরিচালিত সার্ভিলেন্সে ৩০,২৯৩ জন রোগী সনাক্ত করা হয় যাদের মধ্যে ৩৪০ জন মারা যায় (মৃত্যুহার ১.৪১%) (৩)। ভারতে সনাক্তকৃত রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ২.৬% (৪)। মহামারী ঘোষণার পর বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এইচ১এন১ মহামারীর ভাইরাস সনাক্ত করার জন্য বর্তমানে চালু হাসপাতালভিত্তিক সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স এবং এলাকাভিত্তিক সার্ভিলেন্সের আওতা বৃদ্ধি করে। ভাইরাস-আক্রান্ত ভ্রমণকারীদেরকে সনাক্ত করার জন্য আইইডিসিআর ২৯ এপ্রিল ২০০৯ থেকে বাংলাদেশে ঢোকার সবগুলো প্রবেশ পথে বাছাই কার্যক্রম শুরু করে।

আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি এইচ১এন১ রোগী সনাক্ত করে বিমান ও স্থলপথে আগত যাত্রীদের বাছাই করে, এইচ১এন১-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্স থেকে, রোগী হিসেবে স্বেচ্ছায় পরিচয়দানকারীদের মধ্য থেকে এবং ১২টি হাসপাতালে (ছয়টি সরকারি এবং ছয়টি বেসরকারি) পরিচালিত সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স, কমলাপুর এবং মিরপুরে পরিচালিত এলাকাভিত্তিক সার্ভিলেন্স, নসোকমিয়াল সার্ভিলেন্স এবং আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে পরিচালিত সার্ভিলেন্স থেকে। বিমান এবং স্থলপথের প্রবেশদ্বারে আগত যেসব যাত্রী স্বেচ্ছায় ৩৮ ডিগ্রি জ্বর এবং কাশি, গলাব্যাথা অথবা ঘননিঃশ্বাস, ইত্যাদি লক্ষণজনিত অসুস্থতার কথা স্বীকার করেছে, স্বাস্থ্যসহকারীরা তাদের গলার ভিতরের (থ্রোট), এবং নাকের (নাসাল) সোয়াব সংগ্রহ করেন। সেন্টিনেল হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত কিন্তু চলাফেরায় সক্ষম ছিলো এমন রোগীদের কাছ থেকে মাসে দুদিন এবং শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সব রোগীদের কাছ থেকে সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করেন (বক্স ১)। কমলাপুর এবং মিরপুরে চালু থাকা সার্ভিলেন্স এলাকায় চিকিৎসকরা

বক্স ১: রোগের ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসার সুপারিশ

শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগ

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী

- একুশ দিনের মধ্যে জ্বর হয়েছে
- কাশি অথবা গলাব্যাথা

রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুমান করে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন

মারাত্মক নিউমোনিয়া

কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট

- বুক দেবে যাওয়া, বা
- বুকে ঘরঘর শব্দ হওয়া, বা
- খিঁচুনি ছিলো, বা
- পান করতে অপারগ, বা
- লেথারজিক বা অচৈতন্য, বা
- যা খায় তা বমি করে ফেলে

রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুমান করে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ

যেকোনো রোগী যাদের

- জ্বর ছিলো
- কাশি বা গলাব্যাথা ছিলো

রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুমান করে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের, যারা পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু; ৬৫ বছরের বেশি-বয়সী বয়স্ক ব্যক্তি; এবং ডায়াবেটিস দীর্ঘমেয়াদী হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগ, অ্যাজমা, দীর্ঘমেয়াদী যকৃতের রোগ, স্নায়ুতন্ত্রজনিত বা নিউরোমাসকুলার, হেমাটোলোজিক, মেটাবলিক ডিজঅর্ডার এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ; রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের ক্ষয়িষ্ণু; অতিরিক্ত মেদ-ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিবর্গ; অথবা গর্ভবতী মা।

তাঁদের দ্বিসাপ্তাহিক পরিদর্শণের সময় শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত এবং এইচ১এন১ রোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রোগে আক্রান্ত শিশুদের কাছ থেকে নাক-ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। সবগুলো নমুনা কোল্ডচেইনসংযুক্ত ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বির ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় এবং রিয়াল টাইম পলিমিরেজ চেইন রিয়াকশন পদ্ধতিতে চারটি প্রাইমার (ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, সার্বজনীন সোয়াইন, এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯, এবং মানুষের বংশানুগতি সম্বন্ধীয় একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) সেট করে এবং সিডিসি-আটলান্টা প্রটোকল অনুসরণ করে সেগুলো পরীক্ষা করা হয় (৫)।

আইইডিসিআর, আইসিডিডিআর,বি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করার দশদিন পর প্রথম ১০০ জন রোগী এবং তাদের খানাসমূহ পর্যবেক্ষণে রাখে। ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণে রাখা কোনো রোগীর মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে আইইডিসিআর/আইসিডিডিআর,বির একটি দল ওই রোগীর খানা পরিদর্শণ করে এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য তার কাছ থেকে শ্বাসতন্ত্রের নমুনা সংগ্রহ করে। যেসব রোগীর মধ্যে এইচ১এন১ ভাইরাস সনাক্ত করা হয়, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ৭৫ মিলিগ্রামের একটি করে অসেল্টামিভির বড়ি প্রতিদিন দুবার করে মোট পাঁচদিনের চিকিৎসা দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে চিকিৎসা শুরুর দিন থেকে ১০ দিন ধরে সবার কাছ থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিত্র ১: বাংলাদেশে ২০০৯-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচ১এন১ মহামারীতে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত রোগীদের আক্রান্ত হওয়ার দিন

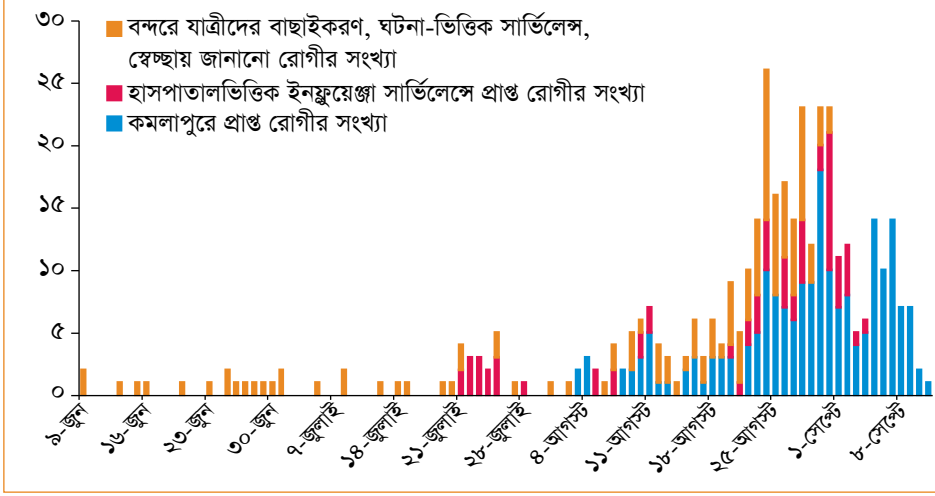

২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর ৬০৪ জন রোগী সনাক্ত করে (চিত্র ১)। ছাব্বিশজন (৪%) রোগী সনাক্ত করা হয় বন্দরসমূহে পরিচালিত ঘটনানির্ভর (ইভেন্ট-বেজড) সার্ভিলেন্স এবং হাসপাতাল থেকে। তাদের মধ্যে ৬০% ছিলো পুরুষ। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের গড় বয়স ছিলো ১৪ বছর (রেঞ্জ: ০.১-৭২ বছর) (চিত্র ২)। সনাক্তকৃত ৬০৪ জন রোগীর মধ্যে আরো ৩৩ জন (৫%) ছিলো ভ্রমণকারী।

পেশা জানা ছিলো এমন ৪৬ জন রোগীর মধ্যে ৩৩% ছিলো সেসব শিশু যারা তখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করে নি, ২৮% ছিলো ছাত্র এবং ১৭% ছিলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী। এই নিবন্ধ প্রকাশের সময়েও সারাদেশ থেকে রোগী সনাক্তকরণ অব্যাহত ছিলো।

চিত্র ২: বাংলাদেশে ২০০৯-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচ১এন১ মহামারীতে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত রোগীদের বয়স

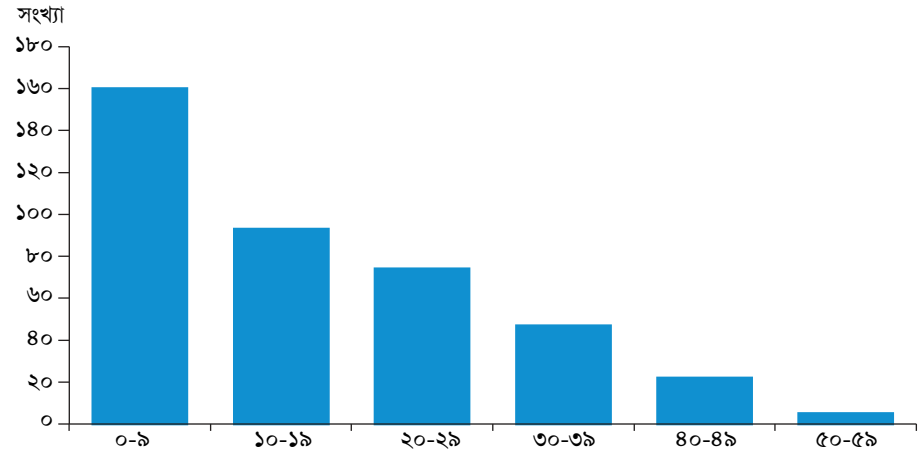

চিত্র ৩: বাংলাদেশে ২০০৯-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচ১এন১ মহামারীতে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত রোগীদের রোগের লক্ষণসমূহ

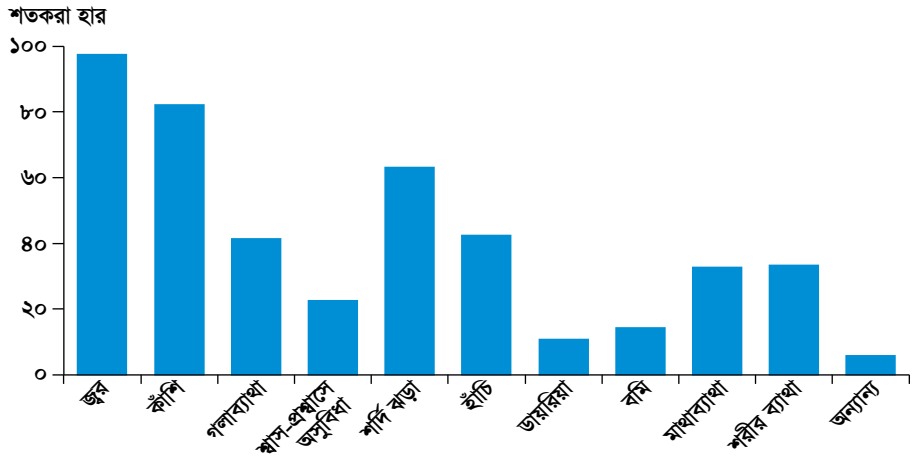

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত রোগীরা তাদের অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে গড়ে সাতদিন চিকিৎসাসেবা নেয়। যে ১৩৪ জনের অসুস্থতাসম্পর্কিত উপাত্ত (ক্লিনিক্যাল ডাটা) পাওয়া গেছে, তাদের ছয়জনের (৪%) দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ ছিলো, তিনজনের (২%) ছিলো ডায়াবেটিস এবং একজনের

(১%) দীর্ঘমেয়াদী হৃদরোগ (উচ্চ-রক্তচাপ ব্যাতীত)। এইচ১এন১-এ আক্রান্ত একজন নারী রোগী গর্ভবতী ছিলেন। আক্রান্ত রোগীরা জ্বর (৯৫%), শুকনা কাশি (৮৫%), গলাব্যাথা (৪৬%), শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট (২২%), বমি হওয়া (১৭%) এবং ডায়রিয়ায় (১৩%) ভোগার কথা জানায়। চারশ সাতানব্বইজন (৮৬%) রোগী হালকা ধরনের অসুস্থতাসহ চলাফেরায় সক্ষম ছিলো। এদের মধ্যে ১৩০ জনের রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জানা ছিলো। তাদের ১১৬ জনের (৮৯%) ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা ছিলো। এইচ১এন১-এ আক্রান্ত রোগীদের ৮৩ জন (১৪%) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো। হাসপাতালে ভর্তি ২০ জন রোগীর মধ্যে ১৫ জন (৭৫%) শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগের সংজ্ঞানুরূপ অসুস্থ ছিলো। বুকের এক্সরে করানো ৭৬ জন রোগীর মধ্যে ৬০ জনের (২৯%) অ্যালভেওলার ইনফিলট্রেট এবং আট জনের (৪%) ইন্টারস্টিশিয়াল ইনফিলট্রেট ছিলো। গুরুতর অসুস্থ রোগীরা এইচ১এন১-এ আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর অসেল্টামিভির গ্রহণ করে (অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে গড়ে সাতদিন চিকিৎসাসেবা নেয়)। মৃত্যুবরণকারী দুজন রোগীর মধ্যে পূর্বে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ ছিলো না এবং তারা রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার দুসপ্তাহেরও বেশি পরে অসেল্টামিভির গ্রহণ করে। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত এমন একজন তৃতীয় পরীক্ষিত রোগীও মারা যায় যার হৃদরোগ ছিলো কিন্তু তা সুনির্দিষ্ট ছিলো না। দুজন রোগীর সংক্ষিপ্ত চরিতালেখ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

১ নং রোগী:

৭ আগস্ট ২০০৯ তারিখে চট্টগ্রামে ২০ বছর-বয়সী একজন পুরুষ উচ্চমাত্রার জ্বর এবং কাশিতে আক্রান্ত হন। তাঁকে চট্টগ্রামের সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়ে আসা হয় এবং দৈবচয়নেরভিত্তিতে তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর ভাইরাস পাওয়া যায়। পরে অনুসন্ধানকারীরা তাঁকে ফোন করে জানতে পারেন যে, তাঁর পরিবারের আট জন সদস্য ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের একজন অসুস্থ আত্মীয় সম্প্রতি ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছিলো। অনুসন্ধানকারীরা তাদের বাড়ি পরিদর্শন করার সময় পরিবারের তিন জন সদস্যকে অসুস্থ দেখতে পান এবং পর্যবেক্ষণের সময় পরীক্ষা করে তাদের সবার মধ্যে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর ভাইরাস সনাক্ত করেন। তাদের পরিবারের যেসব সদস্য ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত ছিলো তারা এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত বলে অনুমান করে তাদের সবাইকে ৭৫ মিলিগ্রামের একটি করে অসেল্টামিভির বড়ি প্রতিদিন দুবার করে পাঁচ দিনের চিকিৎসা দেওয়া হয়, এবং তারা সবাই কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়।

২ নং রোগী:

মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার তৃতীয় দিনে তিন মাস-বয়সী একজন পুষ্টিহীন মেয়ে শিশু ৫ আগস্ট ২০০৯ তারিখে একটি সার্ভিলেন্স হাসপাতালে ভর্তি হয়। মারাত্মক নিউমোনিয়ার জন্য হাসপাতালে তাকে সেফট্রিয়াক্সোন দেওয়া হয় এবং একজন সার্ভিলেন্স চিকিৎসক ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রমণ পরীক্ষা করার জন্য নিয়মমাফিক তার কাছ থেকে নাক এবং গলার সোয়াব সংগ্রহ করেন। ১৫ আগস্ট ২০০৯ তারিখে তাকে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত হিসেবে সনাক্ত করা হয়। একবছরের কম-বয়সী শিশুদের জন্য যেহেতু অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসার সুপারিশ করা হয় না, সেহেতু তাকে ভর্তির সময় অসেল্টামিভির দেওয়া হয় নি। ফলে তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ১৯ আগস্ট অনুসন্ধানী দল হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে

পায়। পরের দিন তার অসুস্থতার ১৬ দিবসে তাকে অসেল্টামিভির দেওয়া হয়, কিন্তু তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। ০২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে সে মারা যায়।

আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি প্রথম সনাক্তকৃত রোগীদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সংস্পর্শে একই পরিবারে বসবাসকারী আরো ২৩ জন রোগী সনাক্ত করে। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত রোগীদের আক্রান্ত হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে তাদের সংস্পর্শে আসা পর্যবেক্ষণকৃত ১২ জনের মধ্যে দুজন ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত হয় (দ্বিতীয়বার আক্রমণের মাত্রা ছিলো ১৭%)। এছাড়া কমলাপুরে ৩০,০০০ মানুষের মধ্যে ২৮০ জন রোগী সনাক্ত করা হয়, যারা চলাফেরায় সক্ষম ছিলো (অ্যামবুলেটরি) (প্রতি ১,০০০ জনে ৯ জন)। ইনফ্লুয়েঞ্জা গবেষণার জন্য পরিচালিত সার্ভিলেন্স-এর ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকেও চলাফেরায় সক্ষম এমন ১২ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত ৬০৪ জন রোগীর মধ্যে তিনজন মারা যায় (মৃত্যুহার ০.৫%)।

প্রতিবেদক: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআ,বি এবং বন্দরসমূহে কর্মরত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ

অর্থনুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বছরব্যাপী একটি ব্যাপক সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক চালু রাখে। সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক বন্দর নগরীগুলোতে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর সূচনা সনাক্ত করে এবং দেশব্যাপী এর বিস্তৃতি লক্ষ রাখে। আলোচ্য গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল বাংলাদেশে মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা বিস্তৃতির সময় এবং ভৌগলিক অবস্থার বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (জামান – অপ্রকাশিত উপাত্ত)।

বাংলাদেশের একটি ব্যাপক জনগোষ্ঠি যারা এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে তাদেরকে কখনো পরীক্ষা করা যাবে না এবং তাদের রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত সার্ভিলেন্সকে সমর্থনের জন্য এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ সনাক্তকরণসম্পর্কিত পরীক্ষার সীমিত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কমলাপুরে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর প্রকোপকে পুরো ঢাকার চিত্র হিসেবে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপর পরিচালিত সার্ভিলেন্স এলাকার প্রকোপকে গ্রামীণ এলাকার চিত্র হিসেবে ধরে নিলে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত সার্ভিলেন্স-এর ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, ঢাকায় এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১৩৫,০০০ জন এবং বাংলাদেশের বাকি এলাকায় মোট ৩২১,০০০ জন।

বিগত দুবছরের মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের ধরন থেকে বোঝা যায় যে, এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ আগামী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছড়াতে থাকবে এবং এইচ১এন১ ভাইরাসটি ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় পুনরায় সংক্রমণ ঘটাতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হলো, সাবান দিয়ে ঘনঘন হাত ধোয়া; চোখ, নাক এবং মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা; হাত দিয়ে না করে কনুই দিয়ে কাশি এবং হাঁচি ঠেকানো; এবং শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত লক্ষণ আছে এমন ব্যক্তিদের নিবিড় সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা (<তিন ফুট)। এধরনের অসুস্থ ব্যক্তিদের বাড়িতে অবস্থান করা উচিত এবং অন্যদের তিন ফুটের মধ্যে আসা উচিত নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত (জ্বর, কাশি অথবা গলাব্যাথা) পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু;

৬৫ বছরের বেশি-বয়সী বয়স্ক ব্যক্তি; এবং ডায়াবেটিস, দীর্ঘমেয়াদী হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগ, অ্যাজমা, দীর্ঘমেয়াদী যকৃতের রোগ, স্নায়ুতন্ত্রজনিত বা নিউরোমাসকুলার, হেমাটোলোজিক, মেটাবলিক ডিজঅর্ডার এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ; রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের ক্ষয়িষ্ণু; অতিরিক্ত মেদ-ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিবর্গ; অথবা গর্ভবতী মায়েদের অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসা নেওয়া উচিত। যারা জ্বর, কাশি, গলাব্যাথা এবং শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত তাদের আক্রান্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশী যাদের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ এবং মারাত্মক রোগের ঝুঁকি আছে তাদের উচিত আগেভাগে হাসপাতালে গিয়ে রোগ পরীক্ষা করানো এবং এইচ১এন১-এ আক্রান্ত মনে করে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসা নেওয়া (বক্স ১)। অসেল্টামিভির নিতে দেরী করলে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হতে পারে এবং মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে (রড্রিগুয়েজ-নরিয়েগা – অপ্রকাশিত উপাত্ত)। নিয়মিত সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের বাইরের রোগীরা এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত কি না তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই বরং অতিসত্ত্বর তাদেরকে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত – কোনোভাবেই অসেল্টামিভির নিতে দেরী করা উচিত নয়। যেখানে মহামারী শুরুর প্রথম দিকে মেক্সিকোর তুলনায় আমাদের এখানে বর্তমান মৃত্যুহার কম, সেখানে মৃত্যুবরণকারী দুজন রোগী তাদের অসুস্থতা শুরুর ৯৬ ঘণ্টা পর অসেল্টামিভির গ্রহণ করে।

মেক্সিকো শহরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রেসপিরেটরি ডিজিজেস-এ ১৮ জন রোগীর মধ্যে ১২ জনের (৬৭%) যান্ত্রিক শ্বাস-প্রশ্বাস (মেকানিক্যাল ভেনটিলেশন) দরকার ছিলো এবং তাদের সাতজন (৩৯%) মারা যায় (৬,৭)। আমাদের রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং মেক্সিকো থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের মধ্যকার অসমতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যখন জনগোষ্ঠি মহামারীতে আক্রান্ত হয়। মেক্সিকো শহরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রেসপিরেটরি ডিজিজেসকর্তৃক উপাত্ত সংগৃহীত হয় ২০০৯-এর ২৪ মার্চ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং ততক্ষণ এটি পরিষ্কার ছিলো না যে, শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের একটি অংশ এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত ছিলো। এর বিপরীতে বাংলাদেশে অবশ্য এ-রোগ প্রবেশের পূর্বে প্রচুর সতর্কতামূলক প্রচারাভিযান এবং একে মোকাবেলা করার জোর প্রস্তুতি ছিলো। বাংলাদেশের রোগীরা তাদের রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার দিন থেকে গড়ে সাতদিনের মধ্যে অসেল্টামিভির নিয়েছে, যেখানে মেক্সিকো শহরের রোগীরা আরো মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ার দিন থেকে গড়ে আটদিন পর চিকিৎসা নিতে গিয়েছে এবং দেরীতে অসেল্টামিভির নিয়েছে। আমাদের এখানে এ-রোগে মৃত্যুর হার কম রাখার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই চিকিৎসা নিতে বিলম্বের হার কমানোর দিকে এখনই নজর দিতে হবে এবং শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত রোগীরা যারা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতার মধ্যে অবস্থান করছে, তারা যাতে তাদের রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অসেল্টামিভির দিয়ে চিকিৎসা শুরু করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

Reference

1. CDC: Outbreak of Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Infection - Mexico, March-April 2009. *MMWR* 2009;58; 467-70.
2. World Health Organization. Transcript of statement by Margret Chan, director-General of the World health Organization. Geneve: World Health Organization 2009. (http://www.who.int/mediacentre/influenzaAH1N1_presstranscript_20090611.pdf, accessed on 13-08-09)
3. World Health Organization. Pandemic (H1N1) 2009 - update 64. Geneva: World Health Organization 2009. (http://www.who.int/csr/don/2009_09_04/en/index.

html, accessed on 10.09-09).
4. India. Directorate General of Health Services. Consolidated status of Influenza A H1N1: 8 September 2009. New Delhi: Directorate General of Health Services, Government of India. 2009. (http://mohfw.nic.in/press_releases_on_swine_flu.htm. accessed on 10-09-09).
5. World Health Organization. CDC Protocol of realtime RTPCR for Influenza A (H1N1). Geneva: World Health Organization 2009. (http://www.euro.who.int/Document/INF/CDC_realtime_RTPCR_H1N1.pdf, accessed on 10-09-09)
6. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, de Leon SP, Hernandez M, Quiñones-Falconi F, Bautista E *et al*. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. *N Engl J Med* 2009;361:680-9.
7. Chowell G, Bertozzi SM, Colchero MA, Lopez-Gatell H, Alpuche-Aranda C, Hernandez M *et al*. Severe Respiratory Disease Concurrent with the Circulation of H1N1 Influenza. *N Engl J Med* 2009;361:674-9.

বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩ ভাইরাসের সংক্রমণে শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত গুচ্ছ এলাকা (ক্লাস্টার)

২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) অভিনব এবং মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১২টি হাসপাতালে একটি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী এবং শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্লাস্টার সনাক্ত করার জন্য সার্ভিলেন্স প্রটোকলটিতে সংবেদনশীলতার পরিধি বৃদ্ধি করে ২০০৯ সালের মে মাসে আমরা এতে কিছু সংশোধনী আনি। ২০০৯ সালের মে-জুন মাসে সার্ভিলেন্স চিকিৎসকরা ৫২৩টি নমুনা সংগ্রহ করেন যেগুলোর মধ্যে ১৮৩টিতে (৩৫%) ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু পাওয়া গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৮৩ জন রোগীর মধ্যে ৯৯ জন (৩৫%) এ/এইচ৩ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ছিলো। শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের ছয়টি ক্লাস্টারও আমরা সনাক্ত করেছি। ওইসব ক্লাস্টারে ১২ জন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে পাঁচজন (৪২%) এ/এইচ৩ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ছিলো।

বিশ্ব জনসংখ্যার ৫-১৫% মানুষ প্রতি বছর মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় এবং যার ফলে ২৫০,০০০-৫০০,০০০ মানুষ মারা যায় (১)। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তিন প্রকার, যথা – এ, বি এবং সি। ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাসসমূহ ঘন ঘন তাদের জেনম পরিবর্তন করার ফলে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা থেকে শুরু করে ব্যাপক এলাকায় (এমনকি পৃথিবীব্যাপী) মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় (১,২)। ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাসের উপরিভাগে হেমাগ্লুটিনিন এবং নিউরামিনিডেজ নামক দুটি শর্করা-আমিষ (গ্লাইকোপ্রোটিন) আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাসের হেমাগ্লুটিনিন-এর ১৬টি এবং নিউরামিনিডেজের ৯টি প্রজাতির সবগুলোই পাখির মধ্যে দেখা যায়। হেমাগ্লুটিনিন-এর মাত্র তিনটি (এইচ১, এইচ২ এবং এইচ৩) এবং নিউরামিনিডেজের মাত্র দুটি (এন১, এন২) প্রজাতি মানুষের শরীরে টিকে থাকার মতো প্রজাতি তৈরি করেছে। এইচ১এন১ এবং এইচ৩এন২ হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিস্তারকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ

প্রজাতিসমূহ যেগুলো এই মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে (১,২)। মাঝে-মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসসমূহের মধ্যে বড় ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন হয়, যার ফলে একটি মহামারীর সৃষ্টি হয়। এই ধরনের একটি তিন দফা বিবর্তিত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের (এইচ১এন১) ফলে বর্তমানে পৃথিবীতে একটি মহামারী চলছে (৩)।

মানুষের মধ্যে সংক্রামিত মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসসমূহের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ (এইচ৩এন২) ভাইরাসের সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং মারা যায় (৪,৫)। বিজ্ঞানীদের একটি গ্রুপের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২-১৯৯২ পর্যন্ত প্রতি মৌসুমে এইচ৩এন২ ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত মহামারীর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৩,০০০-৪৫,০০০ জন মানুষ মারা যায়, যেখানে এইচ১এন১ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত মহামারীতে সাধারণত ২৩,০০০ জনের মৃত্যু হয় (৪)। এই গ্রুপটি দ্বারা প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় যে, ১৯৭০-১৯৯২ সময়ের মধ্যে প্রতি মৌসুমে শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আনুমানিক ১৪২,০০০ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো এবং এর তুলনায় ৭৪,০০০ জন ভর্তি ছিলো এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে (৫)। রক্তবাহিত এবং শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশে প্রদাহজনিত অসুস্থতাও এইচ১এন১ থেকে এইচ৩এন২ সংক্রমণের ফলে বেশি দেখা যায় (৬,৭)। স্বল্প আয়ের দেশসমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রান্ত উপাত্ত খুব কম পাওয়া যায়।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত কোনো বিচ্ছিন্ন রোগী বা এ-রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্লাস্টার নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১২টি হাসপাতালে একটি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম শুরু করে (চিত্র ১)। এই সার্ভিলেন্সের উদ্দেশ্য ছিলো ছড়িয়ে পড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং উত্থিত অভিনব প্রজাতিসমূহ চিহ্নিত করা যেগুলোর দ্বারা মহামারী সৃষ্টি হতে পারে। সার্ভিলেন্স চিকিৎসকরা ভাইরাস ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ার মাধ্যমে গলা এবং নাক থেকে সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করেন এবং রিয়াল টাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পোলিমিরেজ চেইন রিয়াকশন (আরআরটি–পিসিআর) পদ্ধতিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা পরীক্ষা করার জন্য মাঠ-সহকারীরা নমুনাগুলো আইসিডিডিআর,বির ভাইরোলোজি ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেন। সার্ভিলেন্সের প্রথম দুবছরে বেশিরভাগ নমুনাই (৯৬%) সংগ্রহ করা হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা (আইএলআই) নিয়ে হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে আগত রোগীদের কাছ থেকে (বক্স ১)। ওইসময়ে প্রত্যেক মাসে পরপর দুদিন ধরে প্রত্যেকটি হাসপাতালে ভর্তি রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত রোগীদের ওপর আমরা সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি।

চিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রদর্শিত হাসপাতাল -ভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী হাসপাতালসমূহ

বাংলাদেশে মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার জন্য হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের কাছ থেকে আরো সময়োপযোগী নমুনা সংগ্রহ করার লক্ষে ২০০৯ সালের মে মাসে আমরা সার্ভিলেন্স পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনি। হাসপাতালে ভর্তি কোন ধরনের রোগী সার্ভিলেন্সের আওতায় আসবে সে-সংক্রান্ত সংজ্ঞাও আমরা পরিবর্তন করি এবং প্রতেকটি হাসপাতালে তরল নাইট্রোজেন ধারণকারী সিলিন্ডার সরবরাহ করি যাতে মাসব্যাপী হাসপাতালে ভর্তি রোগীর নমুনা জমা করে তা সংগ্রহ করা যায়। শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্ভিলেন্স চিকিৎসকরা পাঁচ বছরের বেশি-বয়সী রোগীদেরকে আলাদা করেন এবং পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুরা মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কি না তা পর্যবেক্ষণ করেন (বক্স ১)। প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক হাসপাতাল থেকে সার্ভিলেন্স চিকিৎসকরা শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগী, মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত পাঁচ জন রোগী এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত ১০ জন রোগীর কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। এছাড়া পারসোনাল ডিজিটাল এসিস্ট্যান্ট (পিডিএ) যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা জনমিতি এবং রোগ-সংক্রান্ত তথ্যাবলীও সংগ্রহ করেন।

শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্লাস্টার সনাক্ত করার জন্য চিকিৎসকরা রোগের সংজ্ঞা অনুযায়ী রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি মিলিয়ে দেখেন (বক্স ১)। ক্লাস্টার সনাক্ত করার পর সার্ভিলেন্স চিকিৎসকরা সাথে সাথে তা আইইডিসিআর/আইসিডিডিআর,বির অনুসন্ধানকারীদেরকে জানান, যারা রোগীদের রোগতত্ত্ব-বিষয়ক সম্ভাব্য সংযোগ, রোগের সংস্পর্শে আসা-সংক্রান্ত তথ্য, এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুর মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। রোগের সঠিক লক্ষণসম্বলিত রোগীদের কাছ থেকে তাঁরা সোয়াব নমুনাও সংগ্রহ করেন। শ্বাসতন্ত্রের *সিনসাইটিক্যাল ভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, মেটানিউমো ভাইরাস, এডিনোভাইরাস, ক্লামাইডিয়া নিউমোনি, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি, লেজিওনেলা নিউমোফিলা* এবং *লেজিওনেলা লংবিচা*সহ শ্বাসতন্ত্রের অনেকগুলো জীবাণু পরীক্ষা করার জন্য সবগুলো নমুনাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইসিডিডিআর,বিতে পাঠিয়ে সেখানকার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং ২০০৯ সালের প্রথম দিকে সংঘটিত ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুমের ক্লাস্টার অনুসন্ধানের প্রতিবেদন আমরা এই নিবন্ধে পরীক্ষা করেছি।

২০০৯ সালের মে-জুন মাসে আমরা ৫২৩টি

বক্স ১: সার্ভিলেন্সের আওতাধীন রোগীর সংজ্ঞা

শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতা (এসএআরই)

হাসপাতালে ভর্তি রোগী:

- ২১ দিনের মধ্যে জ্বরে হয়েছিলো, এবং
- কাশি কিংবা গলাব্যাথা

মারাত্মক নিউমোনিয়া:

কাশি অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট এবং

- বুক দেবে যাওয়া, বা
- বুকে ঘর ঘর শব্দ হওয়া, বা
- খিঁচুনী-সংক্রান্ত, বা
- পান করতে অপারগতা, বা
- তন্দ্রাচ্ছন্নতা কিংবা অচেতনতা, বা
- সব কিছুই বমি করে ফেলে দেওয়া

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা (আইএলআই):

যেকোনো রোগী:

- জ্বরসহ
- কশি কিংবা গলাব্যাথা

ক্লাস্টার:

শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত দু বা ততোধিকসংখ্যক কিংবা মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগী:

- যে ৩০ মিনিট পায়ে হাঁটা পথের দূরত্বে অথবা তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করে, এবং
- সাত দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দেয়

নমুনা সংগ্রহ করি যেগুলোর ১৮৩টিতে (৩৫%) ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ছিলো (সারণি ১)। ২০০৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুম শুরু হয় এপ্রিল মাসে এবং মে মাস থেকে এ/এইচ৩ ভাইরাসের প্রাধান্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে এর প্রকোপ বেড়ে যায় (পৃষ্ঠা ২০-এ সর্বশেষ সার্ভিলেন্স আপডেট দেখুন)। এই নিবন্ধে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৮৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু রোগীর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি; এদের ৯৯ জনকে (৩৫%) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত পাওয়া যায়। হাসপাতালে ভর্তি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীদের মধ্যমা বয়স ছিলো ২৫ বছর। একশ ছেয়াত্তরজন পুরুষ রোগীর মধ্যে ৫৩ জন (৩০%) এবং ১০৭ জন নারী রোগীর মধ্যে ৪৬ জন (৪৩%) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ছিলো (পি<০.০৫)। সবগুলো সার্ভিলেন্স এলাকার হাসপাতালেই এ/এইচ৩ রোগী দেখা যায়। সংগৃহীত নমুনা থেকে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত এ-ধরনের রোগীর আনুপাতিক হার সিলেট হাসপাতালে ৮% থেকে চট্টগ্রাম হাসপাতালে ৫৫% পর্যন্ত দেখা যায়। সবগুলো রোগীর মধ্যে ২১৩ জন (৭৫%) ছিলো গ্রামের বাসিন্দা। হাসপাতালে ভর্তি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীদের সাধারণত কিশোরগঞ্জে বেশি দেখা গেছে – ৯৯ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর ২৫ জনই (২৫%) ছিলো এখানকার রোগী (পি<০.০০১)।

সারণি ১: বাংলাদেশে পরিচালিত আইইডিসিআর/আইসিডিডিআর,বি-র হাসপাতালভিত্তিক সার্ভিলেন্সে নির্ণীত ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর হার: মে-জুন ২০০৯

	সংগৃহীত নমুনা সংখ্যা	ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ১ সংখ্যা (%)	ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩ সংখ্যা (%)	ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৫ সংখ্যা (%)	ইনফ্লুয়েঞ্জা বি সংখ্যা (%)
শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত মারাত্মক রোগ	১৮৬	০ (০)	৭২ (৩৯)	০ (০)	০ (০)
মারাত্মক নিউমোনিয়া	৯৭	০ (০)	২৭ (২৮)	০ (০)	০ (০)
ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা	২৪০	০ (০)	৮৩ (৩৫)	০ (০)	১ (<১)
মোট	৫২৩	০ (০)	১৮২ (৩৫)	০ (০)	১ (<১)

রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি ছিলো জ্বর এবং শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত ৬২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সবারই জ্বর ছিলো। অন্যান্য যেসব লক্ষণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হলো, কাশি (১০০%) এবং শ্বাসকষ্ট (৬১%)। মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত যে ২২ জনের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাওয়া যায় তাদের সবারই জ্বর এবং কাশি ছিলো। এই গ্রুপের রোগীদের মধ্যে অন্যান্য যেসব লক্ষণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হলো, বুক দেবে যাওয়া (৯৬%), নিঃশ্বাসে কষ্ট (৯১%), এবং নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরা (৫৯%)। হাসপাতালে ভর্তি কোনো রোগীই হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন সময়ে মারা যায় নি।

মে-জুন মাসে আমরা শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের ছয়টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করি। এসব ক্লাস্টারে শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে অথবা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ১২ জন রোগী ছিলো, যাদের পাঁচজনের (৪২%) মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩ এবং দুজনের মধ্যে প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা-৩ ভাইরাসের সংক্রমণ ছিলো, এবং পাঁচজনের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটানোর মতো কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি (সারণি ২)। তাদের সবারই জ্বর, কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ ছিলো। ক্লাস্টারের চারজন রোগীর সবারই ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ছিলো এবং বুক দেবে যেতো। ক্লাস্টারে এ/এইচ৩ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত পাঁচজন রোগীর মধ্যে চারজনের বয়স ছিলো পাঁচ বছরের বেশি অথবা ৬৫ বছরের কম এবং বাকি একজন রোগী (যার রোগ পূর্বেই নির্ণীত ছিলো) দীর্ঘকাল ধরে ফুসফুসের রোগে (ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা) ভুগছিলো। হাসপাতালে গড়ে (±এসই) ৮ দিন (±০.৬) ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর ক্লাস্টারের ১২ জন রোগীর সবাই পুরোপুরি অথবা আংশিক সুস্থ হয়ে

যায়। তাদের সবাইকেই এন্টিবায়োটিক (জীবাণুনাশক) ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং সেই সাথে আক্সিজেন দেওয়া হয়, তবে কাউকেই অসেল্টামিভির বা অন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় নি। ক্লাস্টারের যেসব রোগীর মধ্যে এ/এইচ৩ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাওয়া যায়, তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের এলাকায় শ্বাসতন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশে সংক্রমণজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত আরো রোগী ছিলো।

সারণি ২: বাংলাদেশে পরিচালিত আইইডিসিআর/আইসিডিডিআর,বি-র হাসপাতালভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে নির্ণীত ক্লাস্টার-রোগীদের জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফলসমূহ: মে-জুন ২০০৯

	ক্লাস্টার ১	ক্লাস্টার ২	ক্লাস্টার ৩	ক্লাস্টার ৪	ক্লাস্টার ৫	ক্লাস্টার ৬
তারিখ	মে ০৫	মে ২৫	জুন ০৫	জুন ০৬	জুন ১৫	জুন ২৬
জেলা	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	খুলনা	রাজশাহী	কিশোরগঞ্জ	সিলেট
সম্পর্ক	আত্মীয়	অনাত্মীয়	অনাত্মীয়	ভাই	অনাত্মীয়	ভাই
কেস ১						
বয়স	২২ বছর	৭২ বছর	১৮ বছর	৮ মাস	৬৭ বছর	৫ মাস
লিঙ্গ	মহিলা	মহিলা	মহিলা	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ
ঝুঁকির কারণ	এজমা	বৃদ্ধ	হাঁস-মুরগীর মৃত্যু	হাঁস-মুরগী উৎপাদন	বৃদ্ধ	নেই
ল্যাব. ফলাফল	ফ্লু এ/এইচ৩	অজানা	অজানা	ফ্লু এ/এইচ৩	অজানা	প্যারাফ্লু-৩
কেস ২						
বয়স	৯০ বছর	৩০ বছর	১৪ বছর	৮ মাস	৬৫ বছর	৫ মাস
লিঙ্গ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
ঝুঁকির কারণ	বৃদ্ধ	নেই	নেই	হাঁস-মুরগী উৎপাদন	বৃদ্ধ	নেই
ল্যাব. ফলাফল	ফ্লু এ/এইচ৩	অজানা	অজানা	ফ্লু এ/এইচ৩	ফ্লু এ/এইচ৩	প্যারাফ্লু-৩

প্রতিবেদক: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

২০০৯ সালের মে-জুন মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাথমিক পর্যায়ে এ/এইচ৩ ভাইরাসের সংক্রমণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজণিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্লাস্টার দেখা যায়। প্রকাশিত অন্যান্য নিবন্ধে অন্যান্য মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের তুলনায় ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ/এইচ৩ ভাইরাসের রোগ সৃষ্টি করার অধিক ক্ষমতার কথা যেমনটি বলা হয়েছে, আলোচ্য গবেষণায়ও তেমনটি দেখা যায় (৬-৭)। মোট রোগীর চারভাগের একভাগ যেহেতু কিশোরগঞ্জে পাওয়া যায়, সেহেতু ওই এলাকায় একটি বড় ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ/এইচ৩ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। বাংলাদেশে সংঘটিত ইতোপূর্বেকার মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমরা মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ/এইচ১, এ/এইচ৩ এবং বি ভাইরাসের যুগপৎ সংক্রমণ লক্ষ করেছি (সার্ভিলেন্স আপডেট দেখুন)। এ-বছর মৌসুমের প্রথম দিকে প্রায় পুরো সময়ই ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ/এইচ৩ ভাইরাসের প্রাধান্য ছিলো এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভাইরাসে আক্রান্ত মাত্র একটি রোগী ছিলো। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে আমাদের সার্ভিলেন্স কার্যক্রম মহামারী সৃষ্টিকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ/এইচ১ ভাইরাস নির্ণয় করে আসছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত ক্লাস্টার রোগীদের অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার অভ্যন্তরে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব আছে তা জানা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩ ভাইরাস-আক্রান্ত ক্লাস্টারের সব রোগীই হয় শিশু অথবা ৬৫ বছরের বেশি-বয়সী ছিলো বা দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের রোগে ভুগছিলো। গবেষণার এই ফলাফল মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-সংক্রান্ত প্রকাশিত সেসব প্রতিবেদনকে সমর্থন করে, যেখান থেকে বেশি-বয়স্ক এবং দীর্ঘদিন ধরে হার্ট অথবা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা মারাত্মক অসুস্থতা সৃষ্টি এবং অধিক পরিমাণে মৃত্যু ঘটানো-সংক্রান্ত তথ্য জানা যায় (১,৪,৫)। কিছু ক্লাস্টার নমুনায় কোনো ধরনের জীবাণু পাওয়া যায় নি। এই নমুনাগুলো পুনরায় পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া চলছে।

ওষুধ ছাড়া (যেমন, শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, হাত পরিষ্কার রাখা এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা) এবং ওষুধের সাহায্যে (যেমন, টিকা এবং ওষুধের সাহায্যে) উভয় প্রক্রিয়াতেই ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় (৮)। কাঁশি এবং হাঁচি দেওয়ার সময় নাক-মুখ ঢেকে শ্বাসতন্ত্রজনিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বার বার হাত ধোয়া শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটানোর মতো জীবাণুর সংক্রমণ অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে (৯,১০)। আমাদের সার্ভিলেন্সের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগ নিয়ে চিকিৎসাধীন রোগীর অনেক ক্লাস্টার আছে। এসব ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে বড় ধরনের কমিউনিটি প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করা খুব সহজ হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৩, এইচ৫ এবং ২০০৯ সালে মহামারী ঘটানো ভাইরাসের (এইচ১এন১) একযোগে পরিক্রমণ বাংলাদেশকে বিবর্তিত ভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ক্লাস্টার রোগীদের খুঁজে বের করে তাদের সম্পর্কে অনতিবিলম্বে আইইডিসিআরকে জানানোর জন্য সারাদেশব্যাপী চিকিৎসকদের সতর্ক থাকা উচিত।

References

1. Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. *Lancet* 2003;362:1733-45.
2. Salomon R, Webster RG. The influenza virus enigma. *Cell* 2009;136:402-10.
3. Dawood FS, Jain S, Finelli L, Shaw MW, Lindstrom S, Garten RJ *et al*. Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans. *N Engl J M* 2009;360:2605-15.
4. Simonsen L, Clarke MJ, Williamson GD, Stroup DF, Arden NH, Schonberger LB. The impact of influenza epidemics on mortality: introducing a severity index. *Am J Public Health* 1997;87:1944-50.
5. Simonsen L, Fukuda K, Schonberger LB, Cox NJ. The impact of influenza epidemics on hospitalizations. *J Infect Dis* 2000;181:831-7.
6. Frank AL, Taber LH, Wells JM. Comparison of infection rates and severity of illness for influenza A subtypes H1N1 and H3N2. *J Infect Dis* 1985;151:73-80.
7. Wright PF, Thompson J, Karzon DT. Differing virulence of H1N1 and H3N2 influenza strains. *Am J Epidemiol* 1980;112:814-9.
8. Couch RB. Influenza: prospects for control. *Ann Intern Med* 2000;133:992-8.
9. Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C, Dooley L, Ferroni E, Hewak B *et al*. Interventions for the interruption or reduction of the spread of respiratory viruses. *Cochrane Database Syst Rev* 2007 Oct 17;(4):CD006207.
10. Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, Painter J, Billhimer W, Altaf A *et al*. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. *Lancet* 2005;366:225-33.

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে নিম্নবিত্তদের মধ্যে হেপাটাইটিস-ই রোগের প্রাদুর্ভাব

২০০৯ সালের পয়লা জানুয়ারি আমরা ঢাকা শহরের নিকটে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১০ জন প্রজননক্ষম নারীর জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবর জানতে পারি। আমরা প্রাদুর্ভাবটির কারণ, জন্ডিস সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং এর ঝুঁকির সম্ভাব্যতা জাচাই করার জন্য অনুসন্ধান চালাই। অত্র এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ১০০,০০০ জন লোক বসবাস করে। পৌরসভার দুটি পানি-সরবরাহ পাম্পের পানির নমুনা জীবাণুমুক্ত পাওয়া যায়; তবে খানাসমূহের ট্যাপের পানির নমুনায় উচ্চমাত্রায় ফিকাল কলিফর্ম জীবাণু পাওয়া যায়। জন্ডিসে আক্রান্তের হার ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলো ৩% (৪,১৮৮/১২৮,৮৯৯)। জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এমন ২০ জনকে আমরা চিহ্নিত করি। শতকরা সাতাত্তর ভাগ রক্তের নমুনায় (৫৬-৭৩) হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডি সনাক্ত করা হয়। পানি-সরবরাহ পদ্ধতির অব্যবস্থাপনার ফলে জীবাণুযুক্ত পানিই দৃশ্যত এ-ধরনের বড় প্রাদুর্ভাবের কারণ বলে মনে হয়। এসব দ্রুত বর্ধিষ্ণু এলাকায় খাবার পানির গুণগতমান উন্নয়নে সীমিত সামর্থ অনুযায়ী বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস (এইচইভি) একসূত্রবিশিষ্ট আরএনএ ভাইরাস, যা দক্ষিণ এশিয়ায় মলমূত্র দ্বারা দুষিত খাবার পানির মাধ্যমে নিয়মিত প্রাদুর্ভাব ঘটায় (১-৪)। গর্ভবতী অবস্থায় এইচইভি সংক্রমণে নারীরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ফলে মায়ের এবং গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্য মারাত্মক খারাপ হয়ে পড়ে (৫-৬)।

২০০৯ সালের পয়লা জানুয়ারি আইসিডিডিআর,বিতে 'মানসী' নামে মা এবং শিশুস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত একটি সার্ভিলেন্স-এর (৭) সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের একজন সহকর্মী জানান যে, ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ১০ জন প্রজননক্ষম নারী জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। দশজনের মধ্যে চারজন মৃত্যুকালীন সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যেহেতু গর্ভাবস্থায় এইচইভি সংক্রমণের পরিণতি মারাত্মক, তাই আমরা ধারণা করেছিলাম যে, এইচইভি-ই এসব মৃত্যুর কারণ (৫)। আইসিডিডিআর,বি এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) যৌথভাবে প্রার্দুভাবটির ব্যাপকতা, কারণ এবং রোগের সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়সমূহ জানার জন্য অনুসন্ধান করে।

১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ১৫ কিলোমিটার উত্তরে টঙ্গীর একটি খুব ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পাশাপাশি দুটি স্থানে (পূর্ব আরিচপুর এবং পশ্চিম আরিচপুর) জরিপটি পরিচালিত হয়। ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত কারও চোখ এবং গায়ের চামড়া হলুদাভ হলেই তাকে জন্ডিসের রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১২ জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১০ জন মাঠপর্যায়ের গবেষণা সহকারী পূর্ব আরিচপুরের প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি খানা এবং পশ্চিম আরিচপুরের প্রতি ৫ম খানায় কতজন লোক বসবাস করে, তাদের মধ্যে কতজন জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী ছিলো এবং জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের কী পরিণতি (মৃত্যু, সুস্থ এবং তখনও অসুস্থ কী না) হয়েছিলো তা লিপিবদ্ধ করেন। ৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে কর্মীদল পুনরায় পূর্ব আরিচপুরেরর প্রতিটি বড়ির প্রতিটি খানা পরিদর্শন করে এবং জানুয়ারি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত প্রাদুর্ভাবের অবস্থা যাচাই করে। উপরন্তু, কর্মীদল প্রতি ৫ম খানায় জরিপ করে ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে কতজন নারী গর্ভবতী ছিলেন, কতজন গর্ভাবস্থায় জন্ডিসে আক্রান্ত হন এবং ফলে

তাদের গর্ভাবস্থার পরিণতি কী হয় (সুস্থ শিশুজন্ম, গর্ভপাত/মৃত বাচ্চা প্রসব এবং ১ মাসের কম-বয়সী শিশুমৃত্যু) তা লিপিবদ্ধ করে।

পূর্ব আরিচপুর ০.৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাবিস্তৃত। অনুসন্ধানী দলটি ১২,৯৩৮টি খানা পরিদর্শন করে, যেখানে সর্বমোট ৫০,৯৪১ জন মানুষ বসবাস করে। ০.৭৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে পশ্চিম আরিচপুর বিস্তৃত, যেখানে ১৬,৩২৬টি খানায় আনুমানিক ৭৭,৯৭৫ জন মানুষ বসবাস করে। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় আরিচপুরের জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০,০০০ জনের বেশি। এই নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠি প্রধানত পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানার কর্মী, রিক্সাওয়ালা এবং দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। একটি বড়িতে (কম্পাউন্ডে) সাধারণত ১০-১৫টি খানা আছে। একই বাড়িতে বসবাসকারী সবাই একই চুলা, পানির উৎস এবং শৌচাগার ব্যবহার করে। 'মানসী' নামে মা এবং শিশুস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্পটি জানায় যে, প্রতিবছর এলাকার শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ অন্য এলাকা থেকে এই এলাকায় নতুনভাবে বসবাস করতে আসে অথবা এই এলাকা থেকে অন্যত্র চলে যায়।

২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব আরিচপুরে ১৮% (২,২৭৩/১২,৯৩৮) এবং পশ্চিম আরিচপুরে ১১% (১,৯২০/১৬,৩২৬) খানায় জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। জন্ডিসে আক্রান্তের হার পূর্ব আরিচপুরে ছিলো ৫% (২,৫১৩/৫০,৯৪১) এবং পশ্চিম আরিচপুরে ২% (১,৬৭৫/ ৭৭,৯৮৫)। সাধারণত ১৬-৪০ বছর-বয়সীরাই জন্ডিসে বেশি আক্রান্ত ছিলো (সারণি ১)। 'মানসী' প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব আরিচপুরে প্রাথমিকভাবে ১০ জন মৃত নারীকে চিহ্নিত করার পর গবেষক দলটি পূর্ব এবং পশ্চিম আরিচপুরে আরো ১০ জন মৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। মৃত ব্যক্তিদের ৫ জন পুরুষ, ১০ জন নারী (৪ জন গর্ভবতী), ৩ জন এক মাসের কম-বয়সী শিশু এবং ২ জন ছিলো সদ্যপ্রসূত মৃতবাচ্চা। উভয় এলাকাতে সার্বিকভাবে এ-রোগে মৃত্যুহার ছিলো ০.৩ %।

সারণি ১: পূর্ব এবং পশ্চিম আরিচপুরে জন্ডিস রোগীদের জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এবং আক্রান্তের হার

জনমিতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য	পূর্ব আরিচপুর (সংখ্যা=২,৫২৩) সংখ্যা (%)	পশ্চিম আরিচপুর (সংখ্যা=১,৬৭৫)* সংখ্যা (%)	উভয় এলাকা (সংখ্যা=৪,১৯৮) সংখ্যা (%)	পূর্ব আরিচপুরে আনুমানিক আক্রান্তের হার† (জন্ডিস রোগী/মোট জন সংখ্যা) (%)
বয়স (বছরে)				
গড় (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন)	২৫ (১৪)	২৫ (১৪)	২৫ (১৪)	
মধ্যম (সীমা)	২২ (০-৯৮)	২৪ (০-৭২)	২৩ (০-৯৮)	
বয়স-শ্রেণী				
০-৫ বছর	১৫০ (০৬)	১৫৫ (০৯)	৩০৫ (৬)	১৫০/৫,৯৬০ (২.৫)
৬-১৫ বছর	৪১২ (১৬)	২৪৫ (১৫)	৬৫৭ (১৬)	৪১২/৯,৫৯০ (৪.৩)
১৬-৪০ বছর	১,৬৪১ (৬৫)	১,০৭০ (৬৪)	২,৬১১ (৬৫)	১,৬৪১/২৯,৪১৫ (৫.৬)
>৪০ বছর	৩১০ (১২)	২০৫ (১২)	৫১৫ (১২)	৩১০/৭,৪৫৫ (৪.২)
লিঙ্গ				
পুরুষ	১,২৭৫ (৫১)	৯৪৫ (৫৬)	২,২২০ (৫১)	১,২৭৫/২৭,৩৫০ (৪.৭)
নারী	১,২৩৮ (৪৯)	৭৩০ (৪৪)	১,৯৬৮ (৪৯)	১,২৩৮/২৫,০৭০ (৪.৯)

*পশ্চিম আরিচপুরের প্রতি ৫ম খানায় অনুসন্ধান করা হয়। মোট সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রাপ্ত সংখ্যাকে ৫ দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

†বয়স-শ্রেণী নির্ণয়ের জন্য পূর্ব আরিচপুরের প্রতি ৫ম খানায় অনুসন্ধান করা হয়। বয়স-শ্রেণী এবং লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য প্রাপ্ত সংখ্যাকে ৫ দ্বারা গুণ করা হয়েছে। জন্ডিস রোগীদের সংখ্যা আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ থেকে এবং বয়স-শ্রেণী ও লিঙ্গভিত্তিক মোট জনসংখ্যা মার্চ মাসে পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত।

২০০৮ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত জন্ডিসের প্রকোপ প্রতি মাসে বেড়েছে এবং এরপর থেকে প্রতি মাসে কমতে শুরু করে ও ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত কমতে থাকে (চিত্র ১)। পূর্ব আরিচপুরে জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা একভাগ (৬০৩ জন) জন্ডিসে আক্রান্ত হয়। শতকরা ২৩ জন জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসা/আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়ি চলে যায়।

চিত্র ১: মাসভিত্তিক জন্ডিসের ঘটনা: আগস্ট ২০০৮-মার্চ ২০০৯

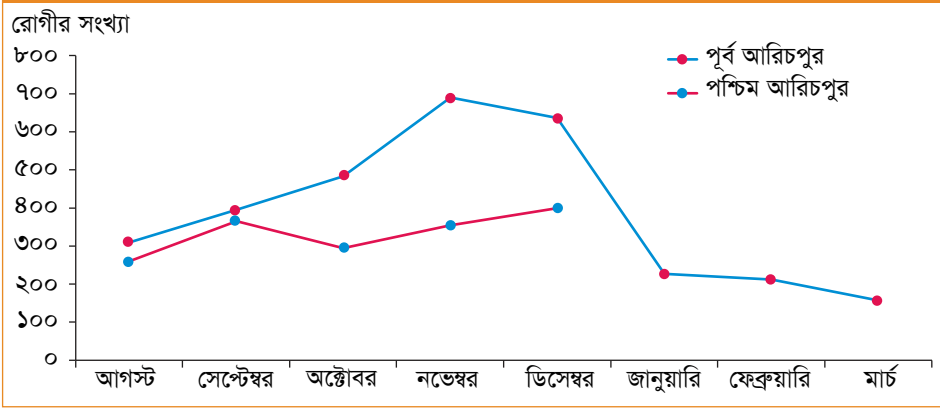

আগস্ট ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত পূর্ব আরিচপুরের প্রতি ৫ম খানায় নারীদের মধ্যে জরিপ করে ২৬৯টি গর্ভধারণ সম্পর্কে জানা যায়, যাঁদের মধ্যে ২১ জন (৮%) নারী জন্ডিসে আক্রান্ত ছিলেন। এই ২১ জনের মধ্যে ৮ জন (৩৮%) জরিপ চলাকালীন সময়ে গর্ভবতী ছিলেন, ৪ জন (১৯%) গর্ভপাত অথবা মৃতবাচ্চা প্রসব করেন এবং ৯ জন (৪৩%) সুস্থবাচ্চা প্রসব করেন। নয়জন সুস্থ নবজাতকের মধ্যে একজন (১১%) এক মাসের মধ্যে মারা যায়। জন্ডিস-আক্রান্ত নন এমন ২৪৮ জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে ২৩ জন (৯%) গর্ভপাত অথবা মৃতবাচ্চা প্রসব করেন এবং ১০০ জন (৪০%) সুস্থবাচ্চা প্রসব করেন, যাদের মধ্যে ৩ জন (৩%) এক মাসের মধ্যে মারা যায়। জন্ডিসে আক্রান্ত গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত এবং এক মাসের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি জন্ডিসে আক্রান্ত নন এমন গর্ভবতী নারীদের তুলনায় বেশি (আনুপাতিক ঝুঁকি ২.২; ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল ১.১-৪.৩)।

সারণি ২: ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব আরিচপুরে জন্ডিস-আক্রান্ত গর্ববতী এবং গর্ভবতী নন এমন নারীদের গর্ভাবস্থার পরিণতি

পরিণতি	জন্ডিস-আক্রান্ত গর্ভবতী (সংখ্যা=২১) সংখ্যা (%)	জন্ডিস-আক্রান্ত নন এমন গর্ভবতী (সংখ্যা=২৪৮) সংখ্যা (%)	মোট (সংখ্যা=২৬৯) সংখ্যা (%)
সাক্ষাৎকারের সময় গর্ভবতী	৮ (৩৮)	১২৬ (৫১)	১৩৪ (৫০)
গর্ভপাত	৪ (১৯)	২৩ (৯)	২৭ (১০)
সুস্থ সন্তান জন্মদান	৯ (৪৩)	৯৯ (৪০)	১০৮ (৪০)
এক মাসের কম-বয়সী শিশুমৃত্যু	১/৯ (১১)	৩/৯৯ (৩)	৪/১০৮ (০৪)

আমরা একই বাড়ির সব মৃতব্যক্তি এবং জন্ডিসে আক্রান্ত অন্যান্য রোগীদের রোগতাত্ত্বিক এবং অসুস্থতা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করি এবং জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হেপাটাইটিস-এ এবং হেপাটাইটিস-ই-এর এন্টিবডি পরীক্ষা করি। মোট ৯২ জন জরিপে অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মতি দেয়। এদের মধ্যে ৭৫ জন জীবিত রোগী এবং ১৭ জন মৃতব্যক্তির প্রতিনিধি (উত্তরদাতা)। পূর্ব আরিচপুরে ১৬ জন এবং পশ্চিম আরিচপুরে একজন মৃত্যুবরণ করে। হলুদাভ চোখ (৯৭%) বা হলুদাভ গায়ের চামড়া (৭৯%) অথবা উভয় লক্ষণের (৭৭%) উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। রোগের অন্যান্য লক্ষণসমূহের মধ্যে সচরাচর প্রাপ্ত লক্ষণসমূহ ছিলো জ্বর (৯০%), ক্ষুধামান্দ (৮৭%), দুর্বলতা (৮২%), বমিবমি ভাব (৭৮%), বমি (৫০%), পেটে ব্যাথা (৪৯%), মাথাব্যাথা (৩০%) এবং ডায়রিয়া (২৫%)। বিরানব্বইজনের মধ্যে ৫২ জন (৬২%) ছিলেন নারী এবং তাঁদের মধ্যে ৪৩ জন প্রজননক্ষম। প্রজননক্ষম-বয়সী (১৫-৪৫ বছর-বয়সী) নারীদের মধ্যে ৮ জন গর্ভবতী নারী জন্ডিসে আক্রান্ত হন, যাদের মধ্যে ৪ জন (৫০%) মারা যান। প্রজননক্ষম নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভবতী অবস্থায় জন্ডিসে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি, গর্ভবতী নন জন্ডিসে আক্রান্ত এমন নারীদের থেকে ৫ গুণ বেশি (আনুপাতিক ঝুঁকি ৪.৮; ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল ০.৭৩-৩৪.২, পি = ০.৪৭)।

পঁচাত্তরজন রোগীর মধ্য থেকে ৭৩টি রক্তের নমুনা হেপাটাইটিস-এ অথবা হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডি সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা করা হয়। বাকি দুজন রক্ত প্রদানে সম্মতি দেয় নি। তেহাত্তরজনের মধ্যে ৫৬ জনের (৭৭%) রক্তে হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডি এবং ৭ জনের (১০%) রক্তে হেপাটাইটিস-এ ভাইরাসের আইজি এম এন্টিবডি পাওয়া যায় (সারণি ৩)।

সারণি ৩: হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই পরীক্ষার ফলাফল (সংখ্যা=৭৩)

	এন্টি-হেপাটাইটিস এ ভাইরাস আইজিএম		
	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট
এন্টি-হেপাটাইটিস ই ভাইরাস আইজিএম			
পজিটিভ	৪	৫২	৫৬
নেগেটিভ	৩	১৪	১৭
মোট	৭	৬৬	৭৩

প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানী দলটি এলাকার পানি-সরবরাহ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে এবং ফিকাল কলিফর্ম জীবাণুর দূষণ যাচাই-এর উদ্দেশ্যে পৌরসভার পানি-সরবরাহ পাম্প ও মৃত ব্যক্তিদের খানাসমূহের ট্যাপ থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে এবং পানি দূষণের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করে।

এলাকার পৌরসভার দুটি পানি-সরবরাহ পাম্পের পানি, একটি অগভীর নলকুপের (টিউবওয়েলের) পানি এবং সাতজন মৃত ব্যক্তির খানাসমূহের ট্যাপের পানির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। পৌরসভার পানি-সরবরাহ পাম্পের পানি এবং অগভীর নলকুপের পানির নমুনা জীবাণুমুক্ত পাওয়া যায়, কারণ তাতে কোনো ফিকাল কলিফর্ম পাওয়া যায় নি; তবে মৃত ব্যক্তিদের খানাসমূহের পানির নমুনায় উচ্চ-মাত্রায় ফিকাল কলিফর্ম পাওয়া যায়। (মধ্যসংখ্যা=৩৮; রেঞ্জ =১২-১২,০০০) (সারণি ৪)।

প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদদের একটি দল জন্ডিস সম্পর্কে এলাকার মানুষের ধারণা, জন্ডিসের কারণ সম্পর্কে তাদের অভিমত, তারা কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং জন্ডিসে তাদের চিকিৎসা নেওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। বেশিরভাগ অধিবাসীই জন্ডিসকে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা সাধারণত জন্ডিসের চিকিৎসার জন্য *কবিরাজ*-এর কাছে যায়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, চিকিৎসকরা বিশ্রাম ব্যাতীত জন্ডিসের অন্য কোনো

চিকিৎসাসেবা দেন না। এলাকাবাসীর ধারণা, পয়োঃবর্জ্য পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে রাস্তা ও নালায় পড়ে বাতাসে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং এই দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস থেকেই সম্ভবত জন্ডিস হয়ে থাকে। খাবার পানির মাধ্যমে জন্ডিস হতে পারে সে ধারণা তাদের নেই।

সারণি ৪: পানির জীবাণু পরীক্ষার ফলাফল

পানির নমুনা	মোট কলিফর্ম*	ফিকাল কলিফর্ম*	মোট জীবাণুর সংখ্যা†
শহরের পানি সরবরাহের পাম্প			
১ নং পাম্পের পানি (সংখ্যা=১)	০	০	১৮০
২ নং পাম্পের পানি (সংখ্যা=১)	০	০	৩৩০
অগভীর নলকূপের পানি (সংখ্যা=১)	০	০	২০
সরবরাহ লাইনের পানি (সংখ্যা=৭) মধ্যম (সীমা)	৭১ (১৬-১৩,০০০)	৩৮ (১২-১২,০০০)	৭২০০ (২,০৮০-১২,৬০০)

*বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী খাবার পানির ফিকাল কলিফর্মের গ্রহণযোগ্য মাত্রা শূন্য।

†যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (ইপিএ)-এর মতে মোট জীবাণুর সংখ্যার গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫০০।

প্রতিবেদক: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেস অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি; রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবেদক: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

এটি ছিলো জনস্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টিকারী হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের একটি বিশাল প্রাদুর্ভাব। জরিপ এলাকার ১৪% খানায় অন্তত একজন করে জন্ডিস রোগী ছিলো। জন্ডিসে আক্রান্তের হার ছিলো ৩%, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘটিত অন্যান্য প্রাদুর্ভাবের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত হার অপেক্ষা বেশি (৩)। গর্ভাবস্থায় অধিক হারে মায়েদের মৃত্যু এবং গর্ভস্থ সন্তান ও নবজাতকের জীবনাশংকা গর্ভাবস্থায় হেপাটাইটিস-ই সংক্রমণের ওপর পরিচালিত অন্যান্য তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা যায় (৬,৮)। গর্ভাবস্থায় রোগের তীব্রতা ও খারাপ পরিণতির সম্ভাব্য কারণসমূহের মধ্যে কম রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুর্বল পুষ্টি, অধিক ভাইরাস এবং হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের সংক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন জেনোটাইপ অথবা সাবটাইপ উলেক্ষখযোগ্য (৮-১০)।

পানি-সরবরাহ লাইনের ছিদ্রের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়ে সম্ভবত এ-রোগের সংক্রমণ ঘটে। কতিপয় কারণে পানি-সরবরাহ লাইনে ছিদ্র এবং পানি দূষিত হতে পারে। যেমন, এলাকাটি নিচু এবং বন্যাপ্রবণ; পানি-সরবরাহ পাইপলাইন পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের পাশ দিয়ে গিয়েছে এবং উভয় লাইনই ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে তলিয়ে যায়; পানি-সরবরাহ পাইপলাইন মাটির উপরিভাগের দূষিত পানির মধ্য দিয়ে এবং কোথাও কোথাও সরাসরি খোলা বর্জ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং প্রধান পানি-সরবরাহ লাইনে ছিদ্র আছে (পাম্প চালকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। উপরন্তু, অনেক অধিবাসী ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রধান পানি-সরবরাহ লাইনের সাথে নিজেদের পানি-সরবরাহ লাইন যুক্ত করেছেন, যার ফলে হয়তো সরবরাহ লাইনে ছিদ্র থাকতে পারে। বাড়িতে পানি-সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ার ফলে পানি-সরবরাহ যখন বন্ধ থাকে, তখন সেখানকার পানির পাইপলাইনে নেগেটিভ চাপ সৃষ্টি হয় যা লাইনের ছিদ্রের মাধ্যমে বর্জ্য টেনে নিতে পারে। পৌরসভার প্রধান পানি-সরবরাহ লাইনে ফিকাল কলিফর্ম জীবাণুর অনুপস্থিতি এবং

খানাসমূহের পানির নমুনায় উচ্চমাত্রায় ফিকাল কলিফর্ম জীবাণুর উপস্থিতি থেকে দূষণের প্রমাণ পাওয়া যায় (মধ্যসংখ্যা = ৩৮; সীমা = ১২-১২,০০০)।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত পানি-সরবরাহ ব্যবস্থা একটি সাধারণ সমস্যা। পানির গুণগত মান, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এলাকার পানির চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত নয়।

হেপাটাইটিস-ই এবং অন্যান্য পানিবাহিত জীবাণুসমূহ যেমন, কলেরা, টাইফয়েড এবং হেপাটাইটিস-এ-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নবিত্ত শহরবাসীর পানির অনুজীবিয় গুণগত মান উন্নত করা প্রয়োজন। খাবার পানির সরবরাহ লাইন এবং পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো সম্পূর্ণ পৃথক করে তৈরি করা পানির গুণগত মান উন্নয়নের সর্বোত্তম উপায়, কিন্তু এটি ব্যয়বহুল হওয়াতে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে খাবার পানি ফুটিয়ে পান করা হবে একটি কার্যকর পদক্ষেপ, তবে প্রতি ১২টি খানা যেখানে একটিমাত্র চুলা ব্যবহার করে এবং একটি খানা তাদের খাবার তৈরির জন্য সারাদিনে মাত্র ৯০ মিনিট সময় পায় চুলাটি ব্যবহারের জন্য, সেখানে খাবার পানি ফুটানোর সময় তাদের জন্য খুবই অপর্যাপ্ত।

ব্যবহারের পূর্বে ক্লোরিন দ্বারা পানি বিশুদ্ধকরণ পানি জীবাণুমুক্তকরণের আর একটি উপায় হতে পারে। তবে সুদানের একটি শ্বরণার্থী শিবিরে হেপাটাইটিস-ই-এর একটি বড় প্রাদুর্ভাবের সময় গভীর নলকূপ থেকে উত্তোলিত পানির তুলনায় নিয়মিত ক্লোরিন দ্বারা বিশুদ্ধ করে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি (০.৩-০.৬ এমজি/লিটার) ব্যবহারে হেপাটাইটিস-ই-তে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিলো। হেপাটাইটিস-ই নিষ্ক্রিয় করার জন্য খুব কম মাত্রায় ক্লোরিনের ব্যবহার এর একটি কারণ হতে পারে (১১)।

এসব দ্রুত বর্ধিষ্ণু লোকালয়ে কমদামী, বাস্তবসম্মত এবং সামর্থ অনুযায়ী কার্যকর উপায়ে খাবার পানির গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

References

1. Dilawari JB, Singh K, Chawla YK, Ramesh GN, Chauhan A, Bhusnurmath SR *et al*. Hepatitis E virus: epidemiological, clinical and serological studies of north Indian epidemic. *Indian J Gastroenterol* 1994;13:44-8.
2. Rab MA, Bile MK, Mubarik MM, Asghar H, Sami Z, Siddiqi S *et al*. Water-borne hepatitis E virus epidemic in Islamabad, Pakistan: a common source outbreak traced to the malfunction of a modern water treatment plant. *Am J Trop Med Hyg* 1997;57:151-7.
3. Labrique AB, Thomas DL, Stoszek SK, Nelson KE. Hepatitis E: an emerging infectious disease. *Epidemiol Rev* 1999;21:162-79.
4. Naik SR, Aggarwal R, Salunke PN, Mehrotra NN. A large waterborne viral hepatitis E epidemic in Kanpur, India. Bulletin of the World Health Organization 1992;70:597-604.
5. Hamid SS, Wasim JSM, Khan H, Shah H, Abbas Z, Fields H. Fulminant hepatic failure in pregnant women: acute fatty liver or acute viral hepatitis? *J Hepatol* 1996;25:20-7.
6. Hussaini SH, Skidmore SJ, Richardson P, Sherratt LM, Cooper BT, O'Grady JG. Severe hepatitis E infection during pregnancy. *J Viral Hepat* 1997;4:51-4.
7. ICDDR,B. Manoshi. (Shttp://www.icddrb.org/activity/?typeOfActivity=Manoshi; 2009. (Accessed on 12-09-09).
8. Jilani N, Das BC, Husain SA, Baweja UK, Chattopadhya D, Gupta RK *et al*. Hepatitis E virus infection and fulminant hepatic failure during pregnancy. *J Gastroenterol*

Hepatol 2007;22:676-82.
9. Pal R, Aggarwal R, Naik SR, Das V, Das S, Naik S. Immunological alterations in pregnant women with acute hepatitis E. *J Gastroenterol Hepatol* 2005;20:1094-101.
10. Kar P, Jilani N, Husain SA, Pasha ST, Anand R, Rai A *et al*. Does hepatitis E viral load and genotypes influence the final outcome of acute liver failure during pregnancy? *Am J Gastroenterol* 2008;103:2495-501.
11. Guthmann JP, Klovstad H, Boccia D, Hamid N, Pinoges L, Nizou JY *et al*. A large outbreak of hepatitis E among a displaced population in Darfur, Sudan, 2004: the role of water treatment methods. *Clin Infect Dis* 2006;42:1685-91.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০০৮-আগস্ট ২০০৯

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৮৬)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা=৫৯৫)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৪.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৬২.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৫.৩	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৪.৯	১.২
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৬.৭	৯৯.৮
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১৫.৫
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০০৮-আগস্ট ২০০৯

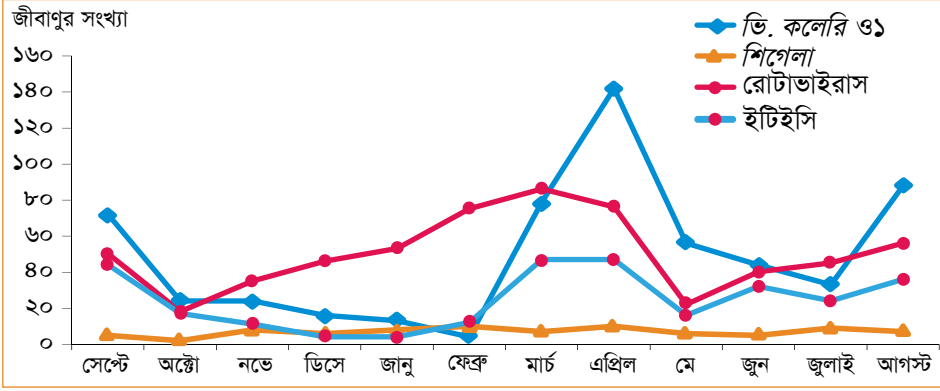

ওষুধের বিরুদ্ধে ৩৫ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: মে ২০০৮-এপ্রিল ২০০৯

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট (সংখ্যা=৩৫)
	প্রাথমিক (সংখ্যা=৩৪)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	৮ (২৩.৫)	০ (০.০)	৮ (২২.৯)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	২ (৫.৯)	০ (০.০)	২ (৫.৭)
ইথামবিউটাল	১ (২.৯)	০ (০.০)	১ (২.৯)
রিফামপিসিন	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
অন্যান্য ওষুধ	৮ (২৩.৫)	০ (০.০)	৮ (২২.৯)

( ) শতকরা হার *একমাস বার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১	০ (০.০)	০ (০.০)	১ (১০০.০)
ক্লোরামফেনিকল	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১	০ (০.০)	০ (০.০)	১ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি–র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৬	১২ (৪৬.০)	০ (০.০)	১৪ (৫৪.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৬	১২ (৪৬.০)	০ (০.০)	১৪ (৫৪.০)
ক্লোরামফেনিকল	২৬	১২ (৪৬.০)	০ (০.০)	১৪ (৫৪.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৬	২৬ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৫	০ (০.০)	২৪ (৯৬.০)	১ (৪.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৬	১ (৪.০)	০ (০.০)	২৫ (৯৬.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: মে ২০০৭-আগস্ট ২০০৯

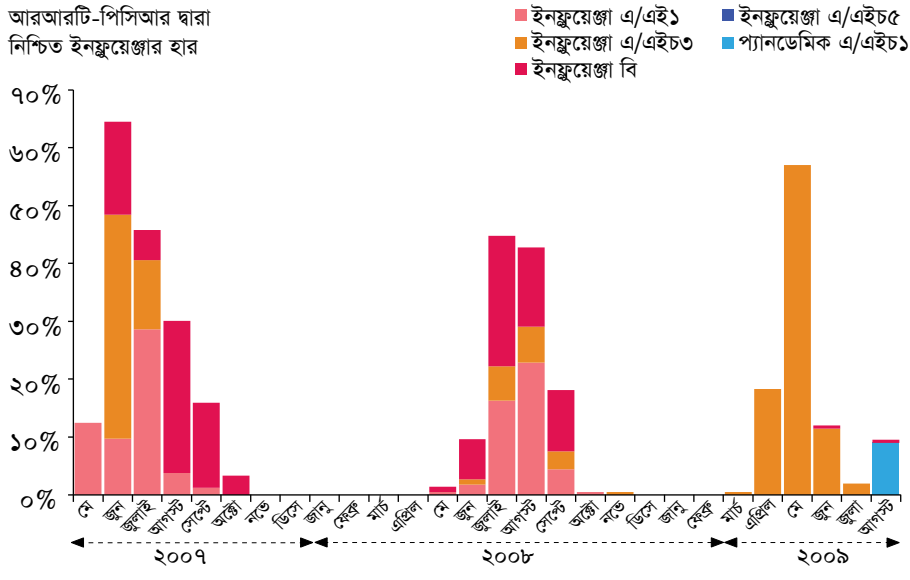

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত একজন রোগী

আইসিডিডিআ,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), রাজকীয় নেদারল্যান্ডস-এর দূতাবাস (ইকেএন), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং সুইডিস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ (সিডা)। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডরথি সাউদার্ন
এডোয়ার্ডো আজিজ বামগার্টনার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ:
সাব্বির হায়দার
২য় নিবন্ধ:
রাশিদ উজ জামান
৩য় নিবন্ধ:
জাহাঙ্গীর হোসেন

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
ডাইনামিক প্রিন্টার্স